বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে : সত্য ও তথ্য

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য
ও সংস্কৃতি সম্মেলন

বরাক উপত্যকা প্রসঙ্গে : সত্য ও তথ্য

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন

সম্প্রতি বরাক উপত্যকার হাইলাকান্দিতে অসম সাহিত্যসভার ৫৪তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। স্থানীয় ও বাইরের সংবাদপত্রসমূহে এই অধিবেশনের কার্য-বিবরণী যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এই ধারণা জন্মানো সম্ভবপর যে আসাম রাজ্যের বরাক উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মধ্যে মিলন সেতু গড়ে তোলার ব্যাপারটাই উক্ত অধিবেশনে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বাস্তবিকই যদি ঐ সম্মেলনের মুখ্য উদ্দেশ্য তাই হতো, তবে আমরাই সবচাইতে আনন্দিত বোধ করতাম, কারণ রাজ্যের ঐ দুইটি অংশের মধ্যে কল্পিত এবং বাস্তব কারণ প্রসূত যে-সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে, জাতীয় সংহতির স্বার্থে তার অবসান অতীব প্রয়োজন। কিন্তু অসম সাহিত্যসভার ৫৪তম অধিবেশনের মাধ্যমে যে-সমস্ত বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে এবং অধিবেশন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ইত্যাদিতে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত রচনাদি স্থান পেয়েছে, তা বিশদভাবে পরীক্ষা করার পর যে-কোনো নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে অসম সাহিত্যসভার হাইলাকান্দি অধিবেশন থেকে মিলনের যে শ্রুতিমধুর ঘোষণা পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপিত হয়েছে, তা একান্তই বাহ্যিক আবরণ মাত্র। ঐ আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত রয়েছে সাংস্কৃতিক ও ভাষিক আগ্রাসনের এক সযত্নরচিত পরিকল্পনা, যার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

বরাক উপত্যকার ভাষিক চরিত্র

হাইলাকান্দি অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও অগপ দলের মন্ত্রী শহীদুল আলম চৌধুরী অসমীয়া ভাষায় রচিত একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেছেন। তাতে এক জায়গায় তিনি বরাক উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত বাংলাভাষার কথ্যরূপটি সম্পর্কে বিস্ময়কর কিছু মন্তব্য করেছেন। মূল বিবৃতি থেকে বঙ্গানুবাদ করে প্রাসঙ্গিক অংশটি আমরা তুলে দিচ্ছি: "এই উপত্যকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যদিও বাংলাভাষায় শিক্ষাদান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্য মানুষেরা ঘরে যে ভাষা ব্যবহার করেন, তা বাংলা নয়। ঐ অঞ্চলের কথিত ভাষাটিকে

কাছাড়ী, সিলেটি বা অন্য কোনো নাম দেওয়া যায়। অসমীয়া আর বাংলার সংমিশ্রণে ঐ ভাষা গড়ে উঠেছে। বহু অসমীয়া শব্দ, যথা মাই, মই, খাইছি, শুনছি, যাম, খাম, ইত্যাদি গ্রামের মানুষ প্রায়ই ব্যবহার করে। সে যাই হোক, শিশু যখন স্কুলে যায়, তখন শুরুতেই তাকে যে ভাষাটা শিখতে হয়, সেটা সম্পূর্ণরূপে তার ঘরে ব্যবহার করা মাতৃভাষা নয়। ফলে তাকে একটা নূতন ভাষা শিখতে হয় এবং তাতে ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বৃত্তি বা গুণের বিকাশ সাধনে বাধার সৃষ্টি হয়। এইজন্যই গ্রামের ছেলেমেয়েরা বাংলা ভাষায় ভালো ফল করতে পারে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ে না। এই সমস্যার কী সমাধান হতে পারে তা আমি ভেবে পাইনি। বরাকী ভাষাও স্কুলে প্রচলন করার উপায় নেই, যেহেতু এই ভাষায় এ পর্যন্ত কোনো বইপত্র লেখা হয়নি।"

শহীদুল আলম সাহেবের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের মতো জটিল বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া পণ্ডশ্রম এবং বিড়ম্বনা মাত্র। বৃহৎ জনগোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত যে-কোনো ভাষারই যে একাধিক উপভাষা থাকে, এবং তার সঙ্গে যে স্ট্যাণ্ডার্ড লিখিত ভাষার একটা পার্থক্য বরাবরই থাকে, এই সাধারণ কথাটাও তিনি জানেন না। খবর নিলে তিনি দেখতেন যে বরপেটা, নলবাড়ি বা লখিমপুরের গ্রামের মানুষ ঘরে যে ভাষা ব্যবহার করে, তার সঙ্গে লিখিত অসমীয়ার পার্থক্য দুস্তর। ঠিক সেইভাবে মেদিনীপুর, মালদহের মতো পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর কথা বাদই দেওয়া যাক, হুগলি, হাওড়ার মতো কলকাতার সন্নিকটস্থ জেলাগুলোর কথ্যভাষাও লিখিত বাংলার সঙ্গে পার্থক্য বহন করে। শহীদুল সাহেব বরাক উপত্যকার কথ্যভাষার ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত শব্দের মিল দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন (যদিও 'যাম' – 'যাব' অর্থে, 'খাম' – 'খাব' অর্থে বরাক উপত্যকায় কারা ব্যবহার করেন আমাদের জানা নেই), তিনি হয়তো বিস্মিত হবেন যে লিখিত বাংলার সঙ্গে লিখিত অসমীয়ার শব্দের মিল আরো চতুর্গুণ বেশি পাওয়া যায়। তাঁর নিজের ভাষণের একটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তাঁর ভাষণের এই বাক্যটি ধরা যাক—"এই জাতীয় অনুষ্ঠানক সর্বাঙ্গসুন্দর করি তোলার বাবে পরম যত্ন লোয়া সত্ত্বেও আমি স্বীকার করিবলৈ বাধ্য যে আমার আয়োজন ত্রুটিমুক্ত করিব পরা নাই।" এই বাক্যে মোট ২২টি শব্দ রয়েছে, তার মধ্যে 'এই', 'জাতীয়', 'অনুষ্ঠান', 'সর্বাঙ্গসুন্দর' ইত্যাদি ১৪টি শব্দ রয়েছে, যা বাংলায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া 'করি', 'লোয়া' (লওয়া), 'আমি'

(আমরা অর্থে), 'আমার' (আমাদের অর্থে), 'পরা' (পারা) ইত্যাদি ৭টি শব্দ রয়েছে, যা বাংলা ভাষার সমঅর্থযুক্ত শব্দের অতি কাছাকাছি, শুধুমাত্র 'বাবে' ('জন্য' অর্থে) শব্দটিই বাংলার সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন। তাই বলে শব্দের এই মিল থেকে এই দাবি কেউ করবেন না যে দুটো একই ভাষা—এই ব্যাপক সাদৃশ্য শুধু এটাই প্রমাণ করে যে বাংলা এবং অসমীয়া ভাষা দুটো একই আদি ভাষা-জননীর গর্ভপ্রসূত। কাছাড়ের কথ্যভাষার সঙ্গে অসমীয়া কোনো কোনো শব্দের মিলের কারণও তাই। এ সম্পর্কে ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য আমরা টীকা অংশে তুলে দিয়েছি।[১]

বরাক উপত্যকার মানুষের মুখের ভাষা বাংলা নয়, এমন বক্তব্য যদি শুধুমাত্র শহীদুল আলম সাহেবের বক্তৃতায়ই ব্যতিক্রম হিশাবে থাকত, তবে তার জন্য আমরা এতটা আশঙ্কাবোধ করতাম না। কিন্তু এই একই কথা ডাঃ বিষ্ণুরাম বৈশ্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত অসম সাহিত্যসভার স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুভাষ নাথের রচনায় রয়েছে—"কাছাড়ের স্থানীয় মানুষের যে একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে তাকে অবহেলা করে কলকাতার দিকে তাকিয়ে থাকার ব্যাপার রয়েছে (অসমীয়া থেকে অনূদিত—পৃ. ৬৭)। নীতিশরঞ্জন লস্করের রচনায় "অসমীয়া, কাছাড়ী, সিলেটি মূলতঃ একই ভাষা" (পৃ. ৮৮)। কনক সেন ডেকার মন্তব্য—"কাছাড়ের স্থানীয় ভাষা যেরকম বাংলা নয়, তেমনি অসমীয়ার সঙ্গেও পুরো মিলে না, কিন্তু সেই ভাষার অসমীয়ার সঙ্গে মিল যে বেশি তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল" (অসমীয়া থেকে অনূদিত, পৃ. ১০১)। এই দৃষ্টান্তগুলোর কথায় পরে আসা যাবে। ডঃ প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্য বেশ গুরু-গম্ভীর একটি আলোচনা ফেঁদেছেন, যার উপসংহার হলো—"কাছাড় অঞ্চলের ভাষা উপভাষার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে কাছাড়ী উপভাষা প্রান্তবর্তী অঞ্চলের ভাষা হিশাবে বাংলার চাইতেও যে অসমীয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ, তা প্রমাণ করা যাবে।"

এই সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিশাবে মন্ত্রী শহীদুল আলম চৌধুরী বরাক উপত্যকার কথ্য বাংলা সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা কোনো বিচ্ছিন্ন বক্তব্য নয়। অসম সাহিত্যসভার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সুচিন্তিত পরিকল্পনার অংশ হিশাবেই ঐ অংশটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কী সেই পরিকল্পনা? তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে ৫ মার্চ তারিখের 'দি আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকার "The Sabha in Retrospect"

শীর্ষক প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনটি রচনা করেছেন অসমীয়া নাট্যকার সত্যপ্রসাদ বরুয়া, যিনি হাইলাকান্দি অধিবেশনে সাহিত্য সভার বিশিষ্ট নেতা হিশাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে হাইলাকান্দি অধিবেশনকালে বরাক উপত্যকার কিছু লোকের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলেছেন এবং তাঁর ভাষায় – "They seemed to be convinced when I told them that they did not speak Bengali in their homes and that they actually spoke a language different from Bengali and this was what we might call Baraki language. I told them that if they cultivated and developed this language, they would soon find out that it had more affinities with Assamese than Bengali. The Assam Sahitya Sabha should take up a scheme of publishing low priced books on cultural integration etc. written not in Assamese but in the spoken language of the people of the Barak valley, interspersed by one or two paragraphs in Assamese, having common words because I felt that this importance to the spoken language would bring them closer to us and would help them establish their identity also their links with the Assamese language." (*The Assam Tribune*, March 5, 1988)

[বঙ্গানুবাদ : "আমি যখন তাদের বললাম যে বাংলা তাদের নিজস্ব ভাষা নয়, তারা তাদের বাড়িতে বাংলা বলে না, এবং তারা আসলে যে ভাষায় কথা বলে তা বাংলার চাইতে আলাদা, এবং এই ভাষাকে 'বরাকী' নামে অভিহিত করা যায়, তখন তারা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছে বলে মনে হলো। আমি তাদের আরো বললাম যে তারা যদি তাদের এই ভাষাকে চর্চার মাধ্যমে উন্নত করে, তাহলে তারা দেখবে যে এর সঙ্গে বাংলার চাইতে অসমীয়ার বেশি মিল রয়েছে। এখন অসম সাহিত্য সভার দায়িত্ব হচ্ছে কম দামের কিছু বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা তৈরি করা, যে বইগুলো অসমীয়া ভাষায় রচিত হবে না, রচিত হবে বরাক উপত্যকার লোকের কথ্য ভাষায়। মাঝে-মধ্যে কিছু অসমীয়া অনুচ্ছেদ তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে, যাতে শব্দের মিলগুলো বোঝা যায়। আমার মনে হয় তাদের কথ্য ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেই তারা আমাদের কাছাকাছি আসবে।

এতে তাদের নিজস্ব পরিচিতি প্রতিষ্ঠায়ও সাহায্য করা হবে এবং অসমীয়া ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার যোগসূত্রও প্রতিষ্ঠিত হবে।"]

সত্যপ্রসাদ বরুয়ার এই বক্তব্যটুকুর মধ্যে বরাক উপত্যকা সম্পর্কে সাহিত্য-সভার সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি সূত্রাকারে বলা হয়েছে। শহীদুল আলমের বক্তৃতায় তথাকথিত 'বরাকী' ভাষা সম্পর্কে কিছু কথা কেন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেনই বা স্মারকগ্রন্থের বিভিন্ন রচনায় বারবার বরাক উপত্যকার ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করার অপচেষ্টা হয়েছে, তা বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হয় না। সোজা কথায় অসম সাহিত্যসভার গর্ভে বরাক উপত্যকার জন্য নূতন এক ভাষা পয়দা হতে চলেছে। অসম সাহিত্যসভাই সরকারী অর্থসাহায্যে এই তথাকথিত 'বরাকী' ভাষায় বইপত্র ছাপবেন এবং তার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করবেন। তারপর কী হবে? সে-উত্তরও স্মারক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, দ্রষ্টব্য পবনকুমার বরুয়ার রচনার শেষ অংশটুকু: "আমিও আশা করিছোঁ যিহেতু রাজ্যভাষা আইনে বরাক উপত্যকাত অসমীয়া ভাষার প্রবেশ রুদ্ধ করা নাই, সেয়েহে অচিরেই হাইলাকান্দি মহকুমা জিলালৈ উন্নীত হওক আরু এই জিলাতেই পোন প্রথমে রাজ্যিক ভাষা অসমীয় সণ্টালকিকৈ প্রয়োগ করা হওক" (পৃ. ১০৭)। (বঙ্গানুবাদ: "আমরাও আশা করছি যেহেতু রাজ্যভাষা আইনে বরাক উপত্যকায় অসমীয়া ভাষার প্রবেশ রুদ্ধ করা হয়নি, তাই অচিরেই হাইলাকান্দিকে জেলা পর্যায়ে উন্নীত করা হোক, আর এই জেলাতেই সর্বপ্রথম রাজ্যভাষা অসমীয়া প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হোক")।

ষড়যন্ত্রের ছকটি অতিশয় পরিষ্কার, শহীদুল আলম সাহেব একটু রেখে ঢেকে কথাটা বলেছিলেন, কিন্তু সত্যপ্রসাদ বরুয়া বা পবনকুমার বরুয়া খুব খোলামেলা ভাবেই পরিকল্পনাটি তুলে ধরেছেন। অসম সাহিত্যসভার প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত অতুলচন্দ্র হাজারিকা একবার বলেছিলেন: "কাছাড়ত মানুহ থকা হলে, অসমত মানুহ থকা হলে আরু অসম সাহিত্য সভার গাত জোর থকা হলে এই পুতৌ লগা অবস্থা নহলহেঁতেন," [বঙ্গানুবাদ: "কাছাড়ে যদি মানুষ থাকত, আসামে যদি মানুষ থাকত, আর অসম সাহিত্যসভার গায়ে যদি জোর থাকত, তবে এই শোচনীয় অবস্থা হতো না")। এখন কাছাড়ে তাঁরা শহীদুল আলমের মতো মানুষ পেয়েছেন, আসামে তো সত্যপ্রসাদ পবন বরুয়ারা আছেনই, এবং সর্বোপরি সম্প্রতি সরকারী আনুকূল্যে অসম সাহিত্যসভার গায়ে পর্যাপ্ত জোর এখন সঞ্চিত

হয়েছে, অতএব বরাক উপত্যকা সম্পর্কে এ ধরনের ষড়যন্ত্রজাল এখন প্রকাশ্যেই রচনা করা সম্ভবপর হচ্ছে।

ভাষাতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা

বরাক উপত্যকার ভাষিক চরিত্রটাকে পাল্টে দেওয়ার জন্য অসম সাহিত্যসভার স্মারকগ্রন্থে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিচিত্র সমস্ত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অবতারণা হয়েছে। সেগুলোতে অবশ্য ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যথার্থ অনুশীলনের কোনো ব্যাপার নেই, যা রয়েছে তা হলো নিছকই শব্দ সন্ধান। বরাক উপত্যকার কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত কিছু শব্দের সঙ্গে অসমীয়া শব্দের মিল দেখিয়েই তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার দৌড় শেষ হয়ে গেছে। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে বরাক উপত্যকার কথ্য ভাষার শব্দসম্ভারের সঙ্গে অসমীয়া কিছু শব্দের যে মিল রয়েছে, তার চাইতে বহু বেশি মিল রয়েছে, লিখিত বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারের সঙ্গে লিখিত অসমীয়া ভাষার শব্দসম্ভারের। তাতে যে বাংলা ও অসমীয়া একভাষা হিশাবে পরিগণিত হতে পারে না, সে কথাটা তো এককালে অসমীয়া পণ্ডিত সমাজকেই প্রমাণ করতে হয়েছিল। তাছাড়া যে সত্যটা বেমালুম চেপে যাওয়া হয়েছে, তা হলো বরাক উপত্যকায় ব্যবহৃত যে শব্দগুলোর সঙ্গে অসমীয়া শব্দের সাদৃশ্য রয়েছে, সেগুলো শুধু যে বরাক উপত্যকার কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তা নয়, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা, রাজসাহী জুড়ে পূর্ববঙ্গের বিশাল এক ভূখণ্ডে এই শব্দগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ রয়েছে। বরাক উপত্যকা এই শব্দগুলো পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রেই অর্জন করেছে।

স্মারকগ্রন্থের কোনো কোনো রচনায় এই মিল প্রতিপন্ন করার জন্য আবার সত্যগোপনের আশ্রয়ও নেওয়া হয়েছে। কনক সেন ডেকা (পৃ. ১০১) বরাক উপত্যকায় ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে অসমীয়ার মিল এবং বাংলার অমিল দেখানোর জন্য নিম্নোক্তরূপে একটি তালিকা তৈরি করেছেন :

কাছাড়ের প্রচলিত ভাষা	অসমীয়া	বাংলা
মানু	মানুহ	মানব
আও	আহ	এসো

কাছাড়ের প্রচলিত ভাষা	অসমীয়া	বাংলা
হকল	সকলো	সমস্ত
মুই	মই	আমি
বেচা	বেচ্	বিক্রয়
মুনি	মুনিহ	পুরুষ
দিমু	দিম	দেব
বেইল	বেলি	সূর্য

তালিকাটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। কাছাড়ে বা বরাক উপত্যকায় মানু এবং মানুষ, দুটো শব্দই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শিষ্ট বাংলায় কি শুধু 'মানব'ই ব্যবহৃত হয়? আমরা তো জানি বাংলায় অহরহ 'মানুষ' শব্দটিই ব্যবহৃত হয়, 'মানব' কথ্য বাংলায় তো কোথাও ব্যবহৃত হয় বলে শুনিনি, লিখিত রূপেও তার ব্যবহার হয় কদাচিৎ। তবুও যে এখানে 'মানব' শব্দটিই দেখানো হয়েছে, 'মানুষ' দেখানো হয়নি, তার কারণ তাহলে তো মানু এবং মানুহ্, এ দুটো শব্দই যে 'মানুষ' থেকে নিষ্পন্ন, তা ধরা পড়ে যাবে। বরাক উপত্যকায় 'সমস্ত' বা 'সবাই' অর্থে 'হকল' ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তা তো শুধু বরাক উপত্যকায়ই নয়, সমগ্র পূর্ব বাংলায়ই প্রচলিত। আর বাংলায় কি শুধু 'সমস্ত'ই চলে, 'সকল' শব্দটিও তো বাংলাই। সে কথাটা দিব্যি চেপে যাওয়া হয়েছে। 'আমি' অর্থে 'মুই' তো পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত। এখানে যাকে 'বেচা' বলা হয়, বাংলায় নাকি তাকে বলে 'বিক্রয়'। 'বিক্রয়' তো তৎসম শব্দ, বাংলায় যতখানি চলে, অসমীয়ায়ও ততখানিই চলে, কিন্তু 'বেচা' যে বাংলায় সবসময়ই ব্যবহৃত হয়, সেই সত্যটা দিব্যি লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। 'দিমু' গোটা পূর্ব বাংলায়ই প্রচলিত। আর 'বেইল' বরাক উপত্যকায় 'সূর্য' অর্থে কখনও ব্যবহৃত হয় না, 'বেইল' বলতে বোঝায় 'বেলা' যা বাংলা 'বেলা' থেকেই নিষ্পন্ন। সন্নিহিত দুটো ভাষাগোষ্ঠীর ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে মিল থাকতেই পারে, থাকতে পারে অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র্য কিংবা পার্থক্যও, কিন্তু মিথ্যাচার এবং অর্ধসত্যের ভেজাল মিশিয়ে সাদৃশ্য বনাম পার্থক্য দেখানোর এই ব্যভিচারী প্রয়াস নিশ্চিতই ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি নূতন সংযোজন।

শ্রীমতী নিরুপমা হাগজের লিখেছেন: "শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলায় বাংলা শব্দের সঙ্গে অসমীয়া শব্দের অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা শব্দের চাইতে আলাদা" (অসমীয়া থেকে অনূদিত)। এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার এসেছে নলিনেন্দ্র বর্মণ, পরাগকুমার দাস, প্রমোদ ভট্টাচার্য বা নগেন বরুয়ার আলোচনায়। তারা ভুলে গেছেন যে বাংলা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই ভাষা নয়, পূর্ববঙ্গের ভাষাও বটে। তারা যদি এই ধরনের মহৎ গবেষণায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাভাষার আঞ্চলিক অভিধানটি একটু নেড়েচেড়ে দেখতেন, তবে যে শব্দগুলোর সঙ্গে অসমীয়া শব্দের সাদৃশ্য নিয়ে তারা তোলপাড় করেছেন, তার প্রায় সবগুলোকেই সেখানে আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন। ফলে আমরাও এই ভাষাতাত্ত্বিক ভোগান্তি থেকে রক্ষা পেতাম।

আরেকটা কথা। শ্রীহট্ট কাছাড় জেলার ভাষা যদি অসমীয়ার এতই কাছাকাছি এবং তা যদি অসমীয়ার একটি উপভাষা হিশাবেই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য—তবে সে বোধোদয় ইংরেজ শাসনের শতবর্ষাধিক কালের মধ্যে ঘটল না কেন? বস্তুত ১৮৩৭ থেকে ১৯৪৭—এই কিঞ্চিদধিক শতবর্ষকাল অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি -প্রেমিকরা শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে দূরে ঠেলতেই চেয়েছেন। তাই ১৯৪৬ সালে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলুই-এর নেতৃত্বাধীন আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি পর্যন্ত তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু বিকাশের পরিপন্থী শক্তি হিশাবে চিহ্নিত করে অবলীলায় ঘোষণা করেছিলেন :

Unless the province of Assam be organised on the basis of the Assamese language and culture, the survival of the Assamese nationality and culture will become impossible. The inclusion of Bengali speaking Sylhet and Cachar (plains portion) and the immigration or importation of lacs of Bengali settlers on waste-lands has been threatening to destroy the distinctiveness of Assam.[২]

সেদিন তাঁদের দৃষ্টিতে কাছাড় ছিল নিশ্চিতই Bengali-speaking এবং আসামের অভ্যন্তরে তার অবস্থান ছিল অসমীয়া সংস্কৃতির পক্ষে ক্ষতিকর। তাহলে আজ কাছাড়ের ভাষা-সংস্কৃতির অসমীয়াত্ব প্রমাণ করার এত গলদঘর্ম প্রয়াস কেন?

ডিমাসা রাজসভার ভাষা :

শ্রীমতী নিরুপমা হাগজের অসম সাহিত্যসভার স্মারক গ্রন্থে লিখেছেন :

"বর্তমান কাছাড়ের কথা বাদই দিলাম, এমন-কি শ্রীহট্টে পর্যন্ত অসমীয়া ভাষাই সরকারী ভাষারূপে প্রচলিত ছিল" (পৃ. ৩৫, অসমীয়া থেকে বঙ্গানুবাদ)। শ্রীমতী হাগজেরের ইতিহাসজ্ঞান রীতিমত দুর্ধর্ষ। প্রাক-ইংরেজ যুগে শ্রীহট্টে সরকারী ভাষা হিশাবে অসমীয়া ব্যবহৃত হওয়ার কী কী প্রমাণ তিনি পেয়েছেন, তা জানতে আগ্রহ হয়। সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত শ্রীহট্টের রাজকার্যে ব্যবহৃত ভাষা ছিল সংস্কৃত, কালাপুরের মরুণ্ডনাথ তাম্রফলক, শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রফলক এবং কেশবদেব-ঈশানদেবের ভাটেরা তাম্রফলক তার প্রমাণ দিচ্ছে। অতঃপর হজরত শাহজলালের সময় থেকে সিরাজদ্দৌলা পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর শ্রীহট্ট ধারাবাহিকভাবে বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলা সুবার দেওয়ানি মোগল সম্রাটের নিকট থেকে আদায় করে, তখনই শ্রীহট্ট ইংরেজ শাসনে যায়। এর মধ্যে অসমীয়া ভাষা সরকারী ভাষা হিশাবে শ্রীহট্টে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগটাই বা কোথায় ছিল?

অতঃপর শ্রীমতী হাগজের বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে ডিমাসা কাছাড়ীদের রাজসভার সরকারী ভাষা ছিল অসমীয়া এবং কাছাড় ইংরেজ অধীনে যাওয়ার পরই ১৮৩৬ সালে এখানে বাংলাভাষার ব্যবহার শুরু হয়। কী আশ্চর্য, তিনি নিজে ঐ আলোচনায়ই ঠিক তার বিপরীত প্রমাণ দাখিল করেছেন। ১৬৫৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের একটি দানপত্র তিনি তুলে দিয়েছেন : "বরখলার চান্দলস্করের বেটা মণিরামকে আমি জানিয়া উজীর পাতিলাম" ইত্যাদি, ঐ দলিলের ভাষা সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : "সনন্দের ভাষা শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রচলিত গ্রাম অঞ্চলের বাংলা বয়ান" (পৃ. ৩৫, অসমীয়া থেকে বঙ্গানুবাদ)। যেহেতু সনন্দের লেখক লেখাপড়া বেশি জানতেন না, তাই ভাষাগত কিছু ভুল ছিল, সেগুলো সংশোধন করে শুদ্ধ বাংলা রূপ কী হবে, তাও শ্রীমতী হাগজের দেখিয়ে দিয়েছেন। অতএব বোঝা গেল ১৭৩৬ সালেই ডিমাসা রাজারা রাজসনন্দে বাংলা ব্যবহার করেছেন। অথচ তারপরই লেখিকা বলছেন যে ১৮৩৬ সালের আগে কাছাড়ে সরকারী কাজে বাংলা ব্যবহার হতো না। এই ধাঁধার জবাব আমরা পাইনি।

ডিমাসা কাছাড়ী রাজারা মাইবং-এ ষোড়শ শতাব্দীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সময় থেকেই যে রাজকার্যে ও সংস্কৃতি-চর্চায় বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়, তার কিছু নিদর্শন আমরা তুলে দিচ্ছি। মাইবং-এ সর্বপ্রাচীন যে লিপিটি পাওয়া গেছে, তা ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের (শক ১৪৯৮)। ঐ লিপির পাঠ হচ্ছে—"শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুক্ত মেঘনারায়ণদেব হাচেংসা বংশ জাত হৈ পাথরে সিঙ্গদ্বার বান্ধাইলেন।" এই বাক্যবন্ধ ক্রিয়াপদের ব্যবহার সহ নিশ্চিতই শ্রীহট্ট অঞ্চলের আঞ্চলিক বাংলা। ব্রহ্মপুরাণের অনুবাদের একটি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেছে, যার লিপিকর (copyist) হচ্ছেন ডিমাসা কাছাড়ী শ্রীঅনন্তরাম বর্মণ। পুঁথির শেষে তিনি স্বহস্তে তারিখ লিখেছেন : "সন ১২০১ বাঙ্গালা মাহে ২৩ অসাড় মঙ্গলবার" ইত্যাদি। অর্থাৎ ১২০১ বঙ্গাব্দে (১৭৯৪ খ্রীঃ) শিক্ষিত ডিমাসারা বাংলা সন তারিখ ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। তারও আগে ১৬৭৭ শকে (১৭৫৫ খ্রীঃ) প্রদত্ত রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণের একটি দানপত্রের বয়ান হচ্ছে : "জঙ্গল আদি আবাদ করত ভাই বাপকে বসাইবায়, তোমরা বসিবায় ও লোক বসাইবায়।" এই ভাষা কি বাংলা নয়? ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের আরেকটি দলিলে পাচ্ছি : "এই জঙ্গলের চতুঃসীমা পূর্বে ওম্রক নদী, পশ্চিমে অলিগাপুর, উত্তরে শিবরখাল, দক্ষিণে বাঙ্গালী নদীখালের মধ্যে বসিতে দিলাম।" দেখতে পাচ্ছি ডিমাসা রাজসভায় বাংলা ভাষা তার আঞ্চলিক রূপ পরিত্যাগ করে সাধুরূপের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ১৭৩৬, ১৭৫৫ ও ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের এই তিনটি দলিল প্রমাণ করছে যে ডিমাসা রাজ্যে বাংলা ধারাবাহিক ভাবে রাজকার্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত প্রমাণ শ্রীমতী হাগজের বা অন্যরা একটিও দেননি, দেওয়া সম্ভবপরও নয়।

রাজা সুরদর্প নারায়ণের আমলে ডিমাসা রাজ্যের দণ্ডবিধি বা আইন রচিত হয়, এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ঐ দণ্ডবিধির সংস্কার করা হয়। বরখলার রায় বাহাদুর বিপিন দেব লস্কর (পূর্বোক্ত উজীর মণিরাম লস্করের বংশধর) ঐ আইন 'হেরম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি' নাম দিয়ে পরবর্তীকালে প্রকাশ করেন। তার ভাষা হচ্ছে :

"জাতি ও গুণে সমান ব্যক্তিকে ক্রোধ করিয়া যদি ভস্ম ও অঙ্গার ক্ষেপ করে কিংবা কর তাড়না করে, তবে রাজাকে দুই রত্তি স্বর্ণ দণ্ড দিতে হয়।"

এই ভাষা নিশ্চিতই বাংলা। যে ভাষায় রাজকীয় আইন রচিত হয়, সে ভাষা যদি সরকারী ভাষা না হয়, তবে সরকারী ভাষা কাকে বলে?

এই সমস্ত তথ্য থেকে এটা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত যে ডিমাসাদের রাজসভায়

রাজকার্য বাংলায় সম্পন্ন হত। এমন-কি ডিমাসারা সংস্কৃতি-চর্চার জন্যও মাতৃভাষার পাশাপাশি বাংলা ব্যবহার করতেন। ডিমাসা কবি চন্দ্রমোহন বর্মণ (অষ্টাদশ শতাব্দী) স্বললিত বাংলায় পদ্য রচনা করেছেন :

"হেড়ম্ব রাজার কথা জিজ্ঞাসিলা তুমি
মন দিয়া শুন কহি অপূর্ব কাহিনী"

অথবা

"বাচস্পতির জন্য আমি হইলাম অপমান
আমা হইতে হইল ইহার অধিক সম্মান"

এটা কোন্ ভাষা ? বাংলা নয় ?

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাংলা গান রচনা করেছেন :

"আমি তোমার তুমি আমার মাও সর্বলোক জানে,
গলায় পলিতা যেন না ছাড়ে ব্রাহ্মণে
চৌদিকে অরণ্যের মধ্যে মাগো
তোমার নামটি জাগে
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ তোমার চরণে মাগে"

পরবর্তী রাজা গোবিন্দচন্দ্র রচিত গান :

"আমরা গোপিনী বিরহে তাপিনী
বিদায় দিও না শ্যাম নিদয় হও না
ছাড়িয়া বন্ধুগণ লইলাম শরণ
স্নেহশূন্য বাক্য বলিও না।"

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে চিঠি দিয়েছেন :

"আমার মুলুকের লোক তোমার মুলুকে জাইতে পারে না, তুমার মুলুকের লোক আমার মুলুকে আসিতে পারে না এই বিষয়ে গরীব লোকের নালিশ নিমিত্ত আমার উকিল কুসালরাম দত্তকে পত্র দিয়া তোমার নিকট পাঠাইতেছি…"

দৃষ্টান্ত আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু প্রয়োজন নেই। এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ডিমাসা রাজসভা এবং রাজ্যের রাজকার্য পরিচালনা এবং সংস্কৃতি-চর্চার ভাষা ছিল বাংলা। শ্রীমতী হাগজের এই সমস্ত অকাট্য তথ্যের সঙ্গে নিজের মনগড়া থিয়োরির সামঞ্জস্য বিধান করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত লিখেছেন :

"কিন্তু দিন দিন হেড়ম্ব রাজ্যে বঙ্গভাষাভাষীদের প্রভাব বেড়ে যাওয়ার ফলে লিখিত ভাষা বাংলার সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়ে। দানপত্র অভয়পত্র ইত্যাদির লেখক যে বঙ্গভাষাভাষী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফলে ওগুলো বাংলা ভাষার অনুরূপ হয়ে পড়ে।" (মূল অসমীয়া থেকে বঙ্গানুবাদ)।

ঠিক এই কথাটি আমরাও বলতে চাইছি। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে ডিমাসা শাসকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের রাজকার্য ও সংস্কৃতির ভাষা হিশাবে বাংলাকে গ্রহণ করেছিলেন। ঠিক একইভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহোম রাজারা নিজস্ব 'তাই-আহোম' (Tai-Ahom) ভাষা ত্যাগ করে অসমীয়া ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। রাজা তথা শাসক সম্প্রদায় যেখানে স্বেচ্ছায় প্রজার ভাষা ব্যবহার করেন, তখন তা হয় সাংস্কৃতিক সমন্বয়, আর রাজা বা শাসক সম্প্রদায় যখন জোর করে প্রজার উপর নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দিতে চান, তখন তা হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। দুর্ভাগ্যত শ্রীমতী হাগজের আজ সেই আগ্রাসনের সহায়ক শক্তি হিশাবে কাজ করছেন।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি তথ্যগত ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করতেই হয়। ১৭৩০ সালে সুরদর্প নারায়ণের রাজকবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি 'নারদীয় কথামৃত' রাজমাতার আদেশে অনুবাদ করেন। ভুবনেশ্বর বাচস্পতিকে ডিমাসা রাজ্যের প্রথম বাঙালী কবি হিশাবে ধরা হয়। অসম সাহিত্য সভার স্মারকগ্রন্থের একাধিক আলোচনায় দাবি করা হয়েছে যে বাচস্পতি মহাশয় নাকি অনুবাদটি করেছেন অসমীয়া ভাষায়। বাচস্পতির অনুবাদের ভাষা নিম্নরূপ :

অদ্যাবধি পুণ্যধারা বহিছে ভুবনে
কৃতার্থ হইতেছে লোক গঙ্গা দরশনে
পরশ করিলে পাপ যায় অতি দূরে
পর উপকারে প্রাণ দিলা গয়াসুরে।

১৭৩০ সালে রচিত এই পয়ার যদি বাংলা না হয় তবে বাংলা কাকে বলে?

ভুবনেশ্বর বাচস্পতিকে অসমীয়া কবি হিশাবে প্রতিপন্ন করার জন্য শ্রীপ্রমোদ ভট্টাচার্য স্মারক গ্রন্থে লিখেছেন : (গদ্য অংশটুকু মূল অসমীয়া থেকে অনুবাদ)— "অসমীয়া ভাষার নেতিবাচক 'ন', 'না' ক্রিয়াপদের আগে বসার নিয়ম কাছারী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষায় রক্ষিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভুবনেশ্বর বাচস্পতির নারদীয় পুরাণের চার ছত্র তুলে দেওয়া হল :

"প্রণমহু ভূমিপতি লক্ষ্মী ঠাকুরাণি
বিষ্ণুর বল্লবা কামদেবের জননী
ক্ষিরদ তনয়া দেবি ভকত বৎসলা
না বুঝিয়া মূঢ় লোকে বলে ত চঞ্চলা।"

(স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ১১১)।

এখানে 'না বুঝিয়া' এই প্রয়োগটি লেখকের সিদ্ধান্তের উৎস। একথা সত্যি যে বাংলা গদ্যে নেতিবাচক 'না' সাধারণতঃ ক্রিয়াপদের পরেই বসে (ব্যতিক্রমও রয়েছে, যথা, 'না বলেকয়ে চলে গেলে', 'না জেনে কথা বল না' ইত্যাদি) এবং অসমীয়ায় নেতিবাচক শব্দটি বসে ক্রিয়ার আগে। কিন্তু বাংলা কবিতায় যে নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদের আগে অহরহই বসে, এ খবরটি শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নেন নি। নিলে ভালো করতেন, নইলে খোদ রবীন্দ্রনাথও নেতিবাচক 'না' ক্রিয়াপদের আগে ব্যবহার করার সুবাদে সমজাতীয় সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে যাবেন। কারণ কে না জানে যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে', 'আমার না বলা বাণীর', 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়', 'নাহি নিন্দে বিধাতারে', 'না জানি কেন রে এতদিন পরে' ইত্যাদি। এমন-কি, যে দুটি শব্দপ্রয়োগের জন্য কাব্যরচনার আড়াইশত বৎসর পরও বাচস্পতি মশাই-এর রেহাই মিলছে না, সেই 'না বুঝিয়া' শব্দ দুটিও চলিত রূপে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন : 'না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে'। না বোঝাটা কার জানি না, আঁখিজলে অবশ্য আমরাই আজ ভাসছি।

আহোম রাজপুরুষ এবং রাজপুরোহিতরা সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ লিখে রাখতেন, তাকে বলা হয় বুরঞ্জী। এই বুরঞ্জীগুলো (বুরঞ্জী=ইতিহাস) খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, কারণ বুরঞ্জী লেখকদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই ছিল বাস্তব নিষ্ঠা। 'দেওধাই বুরঞ্জী'তে রাজপুরোহিতগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ আহোম রাজসভা ও রাজত্বের কিছু তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ সংকলিত হয়েছে। ঐ সংকলনের একটি অংশে কাছাড়ী রাজের দূতের সঙ্গে আহোম রাজদরবারের জনৈক সভাসদের কথোপকথন উদ্ধৃত হয়েছে। সেখানে কাছাড়ী দূতের মুখে যে ভাষা বসানো হয়েছে তা শুদ্ধ অসমীয়া নয়। 'দেওধাই বুরঞ্জী' সম্পাদনার সময় কাছাড়ীদূতের মুখে উচ্চারিত ঐ ভাষাকে সম্পাদক ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা 'বিদেশী উচ্চারণ' ('হেনা হুচা') ও 'বিকৃত' বলে অভিহিত করেছেন। ডিমাসা কাছাড়ী রাজা তাম্রধ্বজ

(সপ্তদশ শতকের শেষভাগ) কর্তৃক প্রেরিত কাছাড়ীদূতের মুখের ভাষা 'দেওধাই বুরঞ্জী'তে নিম্নোক্তরূপে উদ্ধৃত হয়েছে :

"গোসাঁই গোসাঁনীর কৃপাই কোনো ছত্রে পরাভায়ো **করিতে পারিবে না।** ...প্রাণীপ্রজা **সকলকে সমভাবে** প্রতিপালন করি মহারাজা **কুশলে** আছে।... কিছোশ্রমে ভয়ভ্রান্তি **প্যাল্যাম না, নিভয়ে পৌঁছিলাম।"**

যে বাক্যাংশগুলো বড় অক্ষরে দেওয়া হলো, তা যে প্রায় নির্ভেজাল বাংলা, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুনিষ্ঠ বুরঞ্জী রচয়িতা কাছাড়ী রাজদূতের মুখের ভাষাকে যথাসাধ্য অবিকৃতভাবে ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন, সর্বত্র সফল হন নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু অসমীয়ার সঙ্গে বাংলা ভাষার পার্থক্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো তারা প্রশংসনীয়ভাবে ধরতে পেরেছিলেন এবং সেগুলো কিন্তু প্রায় যথাযথভাবেই বসিয়েছেন। কাছাড়ী রাজসভার ভাষার যথার্থ পরিচয় সম্পর্কে সম-সাময়িক আহোম রাজসভার ঐতিহাসিকরা যে সচেতনতা দেখিয়েছেন, সেই সচেতনতা ও বস্তুনিষ্ঠার সামান্যতম উত্তরাধিকার যদি অসম সাহিত্যসভার স্মারক গ্রন্থটি বহন করত, তবে আমরা ধন্য হতাম।

বরাক উপত্যকায় প্রচলিত লিপি

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বাংলা লিপির সঙ্গে অসমীয়া লিপির কোনো পার্থক্য নেই, শুধু 'র' অক্ষরটি অসমীয়াতে 'ব' এর নীচে ফুটকি দিয়ে লেখা হয় না, লেখা হয় 'ব'য়ের মধ্যাংশে একটা রেখা টেনে দিয়ে। সাধারণ ভাষায় একে পেটকাটা 'র' বলা হয়। এই একটিমাত্র পার্থক্যকে সম্বল করে অসম সাহিত্য সভার স্মারক-গ্রন্থে চমকপ্রদ সমস্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে।

ডিমাসা কাছাড়ী রাজাদের আমলের দুটি প্রস্তর ফলক এবং কয়েকটি দলিলে পেটকাটা 'র' ব্যবহৃত হয়েছে। এতেই নিরুপমা হাগজের, পরাগকুমার দাস এবং রামচরণ ঠাকুরীয়া একেবারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত যে এই পেটকাটা 'র'ই প্রমাণ করছে বরাক উপত্যকায় ঐ সময়ে অসমীয়া ভাষা প্রচলিত ছিল।

বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া ভালো। উৎসাহের আতিশয্যে এই সমস্ত গবেষকরা ভুলে গেছেন যে লিপি এবং ভাষা সম্পূর্ণ ভিন্নবস্তু, আজকাল ইংরেজী লিপিতে খাসি, মিজো প্রভৃতি ভাষার পুস্তকাদি

প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে সে ভাষাগুলো ইংরেজী হয়ে যাচ্ছে না। তাই প্রথমেই বিচার করা প্রয়োজন যে পেটকাটা 'র' যে সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে বিরাজিত, তার ভাষাটা কি? দেখা যাবে ঐ সমস্ত ফলক কিংবা দলিলের ভাষা সংস্কৃত কিংবা বাংলা, অসমীয়া ভাষায় রচিত ডিমাসা রাজবংশীয় একটিমাত্র ফলক কিংবা দলিল এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

বাংলা বর্ণমালার বিবর্তনের ইতিহাস জানলে এই সমস্ত লেখকরা পেটকাটা 'র' নিয়ে এত হইচই নিশ্চয়ই করতেন না। বরাক উপত্যকার সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক দেবব্রত দত্ত এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "খাসপুরে প্রাপ্ত শিলালিপির পেটকাটা 'র'-কে অসমীয়া কৃষ্টির নিদর্শন বলে গ্রহণ করা হাস্যকর, প্রাচীন বাংলাতেও পেটকাটা 'র'-এর প্রচলন ছিল।" এই অতিসঙ্গত কথাটুকু বলার জন্য শ্রীদত্ত স্মারকগ্রন্থে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছেন। ডঃ রামচরণ ঠাকুরীয়া লিখেছেন : "শ্রীদত্তের এই মন্তব্য কতখানি চিন্তাপ্রসূত, তা ভেবে দেখার বিষয়, কেননা, প্রাচীন বাংলা লিপিতে পেটকাটা 'র'-এর ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা আলোচনার সুযোগ থাকলেও ঐ শিলালিপি খোদিত হওয়ার সময়ে যে বাংলা ভাষায় পেটকাটা 'র'-এর প্রচলন ছিল না, তা ধ্রুব সত্য" (অসমীয়া থেকে অনূদিত, পৃ. ১১৮)। ডঃ ঠাকুরীয়া যাকে ধ্রুব সত্য বলছেন, তা কিন্তু ততটা ধ্রুব নয়।

খাসপুরের দুটো শিলালিপিই অষ্টাদশ শতকের। বাংলা লিপির বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার সর্বত্রই এককালে পেটকাটা 'র' ব্যবহৃত হতো। বাকুড়ায় প্রাপ্ত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র পুঁথির 'র' পেটকাটা, সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড (পূর্বার্ধ) এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ ইতিহাস'-এ তার ফোটো প্রতিলিপি মুদ্রণ করা হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক সংগ্রহকৃত অজস্র বাংলা পুঁথিতে পেটকাটা 'র' রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পেটকাটা 'র'-এর প্রচলন কমে আসে, কিন্তু অষ্টাদশ শতকেও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিতে যে ফলকগুলি উৎকীর্ণ হয়েছে, তার 'র' পেটকাটা। সামগ্রিকভাবেই ঐ ফলকগুলির সঙ্গে খাসপুরের মন্দিরফলকের সাদৃশ্য এত বেশি যে মনে হয় দুটোর মধ্যে কোনো সংযোগ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। পূর্ববঙ্গের ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি জেলায় পেটকাটা 'র' প্রচলিত ছিল উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। বাংলা-ছাপাখানা ব্যাপকভাবে প্রকাশনা শুরু করার পরই পূর্ববঙ্গ

থেকে পেটকাটা 'র'-এর ব্যবহার লিপিকররা পরিত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কয়েক শ' বাংলা পুঁথি রয়েছে, যার 'র' পেটকাটা। অতএব অষ্টাদশ শতকে বাংলা লিপিতে পেটকাটা 'র'-এর প্রচলন আদৌ ছিল না বলে ডঃ ঠাকুরীয়া যা বলেছেন, তা ধ্রুবও নয়, সত্যও নয়। বরাক উপত্যকা পেটকাটা 'র' পেয়েছে পূর্ববঙ্গ থেকে, শ্রীহট্টের প্রভাবে। শ্রীমতী নিরুপমা হাগজের লিখেছেন, "দানপত্র অভয়পত্র আদির লেখক বঙ্গভাষাভাষী মনুহ আছিল সন্দেহ নাই।" এই বঙ্গভাষাভাষী লিপিকররা বাংলা বা সংস্কৃতে লিপিগুলি লেখার সময়ে শুধু শুধু অসমীয়া 'র' ব্যবহার করতে যাবেন কেন, সে প্রশ্নটা ডঃ ঠাকুরীয়া আদৌ বিবেচনাযোগ্য মনে করেননি। আসলে বঙ্গভাষী ঐ সমস্ত লিপিকররা পেটকাটা 'র'-কে বাংলা 'র' বলেই জানতেন। আমাদের কাছেই ১৭৫৫ সালের একটি দলিল রয়েছে, যার ভাষা বাংলা, কিন্তু 'র' পেটকাটা।

শুধুমাত্র 'র'-এর উপর নির্ভর করে একটি অঞ্চলের সংস্কৃতিগত ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্য নিরূপণের চেষ্টার মধ্যে অন্য যে বিচার-বিভ্রাট ঘটার সম্ভাবনা রয়ে গেছে, ডঃ ঠাকুরীয়া বা তাঁর সমমতাবলম্বীরা তা লক্ষ্য করেননি। গুয়াহাটির কাছে কামাখ্যা পাহাড়ে একটা তাম্রফলকে একজন রাজার নাম পাওয়া গেছে যিনি নিজেকে বলছেন 'কামরূপেশ্বর মাধবদেব'। কামরূপেশ্বর মাধবদেবের ওই তাম্রফলকের তারিখ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার স্থির করেছেন পঞ্চদশ শতক, ডঃ মহেশ্বর নিওগ তাঁর 'প্রাচ্য শাসনাবলী' গ্রন্থে ঐ তারিখটি সাধারণভাবে মেনে নিয়েছেন। ঐ তাম্রফলকে প্রথমসারিতে 'র' লেখা হয়েছে 'র'য়ের নীচে ফুটকি দিয়ে, এবং পরবর্তীর 'র'গুলোর নীচে ফুটকি ভালো বোঝা যায় না, কিন্তু একটিতেও পেটকাটার কোনো ব্যাপার নেই। যাই হোক, এই ফলকে আমরা পাচ্ছি যে কামরূপ অঞ্চলেও পঞ্চদশ শতকে ফুটকি দেওয়া 'র' চলত, হতে পারে সীমিত ক্ষেত্রে। ডঃ ঠাকুরীয়া বা তাঁর সমমতাবলম্বীদের যুক্তিধারা অনুসরণ করলে অনায়াসে বলা যেতো যে ঐ 'র' থেকে প্রমাণিত হচ্ছে পঞ্চদশ শতকের কামরূপ বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাবাধীন ছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাস রচনাকে আমরা ব্যভিচার বলে মনে করি, তাই এক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে একটা সময়ে সমগ্র পূর্বভারতেই দু'ধরনের 'র'ই পাশাপাশি চলত, উনবিংশ শতাব্দীতে ছাপার অক্ষর চালু হওয়ার পরই দুটি বর্ণমালার লিপি সুনির্দিষ্ট ভাবে আলাদা হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দের কানাই বরশী শিলালিপি, যাকে অসমীয়া লিপির

আদিমরূপ সকলেই স্বীকার করেন, সেখানে 'র' কিন্তু পেটকাটা নয়, সেখানে 'ব'য়ের নীচে বৃত্ত দেওয়া, যা ফুটকিরই পূর্বতন রূপ।

ডঃ ঠাকুরীয়া উৎসাহের আতিশয্যে আরো বলেছেন, "সপ্তম শতকে ভাস্করবর্মার সময়ের যে তাম্রফলকটি সিলেটের নিধনপুরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে স্পষ্ট এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায় যে সেই সময়েই বরাক উপত্যকায় অসমীয়া লিপির সম্প্রসারণ ঘটেছিল।"—অর্থাৎ তাঁর মতে নিধনপুর তাম্রফলকের অক্ষরও অসমীয়াই।

মনে হচ্ছে ডঃ ঠাকুরীয়া নিধনপুর তাম্রফলকটি সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান না করেই কথাগুলো মনের আনন্দে বলে ফেলেছেন। প্রথমতঃ, ঐ তাম্রফলকেই উল্লেখ রয়েছে যে লিপিটি খোদাই করা হয়েছিল কর্ণসুবর্ণে। কর্ণসুবর্ণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার কানসোনা গ্রামের প্রাচীন নাম। অসমীয়ালিপির বিকাশ যদি মুর্শিদাবাদেই ঘটে থাকে, তবে ডঃ ঠাকুরীয়া তাঁর দাবি সেখানকার উপরই পেশ করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ বিশিষ্ট সমস্ত অসমীয়া ঐতিহাসিকই, যথা কনকলাল বরুয়া, প্রতাপচন্দ্র চৌধুরী বা মুকুন্দমাধব শর্মা, এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন যে নিধনপুর তাম্রফলকে যে জমি দান করা হয়েছে সে জমির অবস্থান ছিল বিহার প্রদেশে, সিলেট জেলায় নয় (দ্রষ্টব্য : K.L. Barua : *Early History of Kamrupa ;* P. C. Choudhury : *The History of the Civilization of the People of Assam ;* Mukundamadhav Sarma : *Inscriptions of Ancient Assam*)। তেরোশত বছর আগে কতিপয় ব্রাহ্মণ যদি ভাস্কর বর্মার নিকট থেকে সুদূর বিহার প্রদেশে কিছু জমি লাভ করে থাকেন তবে এতদিন পর তার দায় বরাক উপত্যকাবাসী কেন বহন করবেন, সে প্রশ্ন তোলা যায় বৈকি ?

সবচাইতে বড়ো কথা হচ্ছে, নিধনপুর লিপি খোদাই করা হয়েছে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে, তখন তো বাংলা, অসমীয়া প্রভৃতি আঞ্চলিক লিপিগুলোর জন্মই হয়নি। নিধনপুর লিপির অক্ষর সম্পর্কে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ডঃ মুকুন্দমাধব শর্মার বক্তব্য : "In the C. P. Grant of Nidhanpur, we have the eastern variety of the north Indian Brahmi alphabet current during the seventh century" (*Inscriptions of Ancient Assam,* p. 38) (বঙ্গানুবাদ : "নিধনপুর তাম্রফলকে আমরা সপ্তম শতকে প্রচলিত উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির প্রাচ্যরূপটি লক্ষ্য করি")। এই উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী

লিপিকে ডঃ ঠাকুরীয়া অসমীয়া লিপি হিশাবে চিহ্নিত করেছেন। নিধনপুর তাম্রফলক কিন্তু গুয়াহাটি মিউজিয়মেই রক্ষিত রয়েছে, ডঃ ঠাকুরীয়া নিজেই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে পারেন।

অসমীয়া লিপির সুনির্দিষ্টরূপটি বিকাশলাভ করে আরো অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পর। ডঃ মহেশ্বর নিওগ এ সম্পর্কে বলেছেন: "দ্বাদশ শতকে কামরূপের হিন্দুরাজারা সমস্ত ফলকে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং সেই ফলকগুলির লিপি হল অসমীয়ার পূর্বরূপ। এই সমস্ত রাজাদের পরই অসমীয়া লিপি স্পষ্টরূপ ধারণ করে" (প্রাচ্য শাসনাবলী, পৃ. ৯, অসমীয়া থেকে অনূদিত)। ডঃ ঠাকুরীয়ার কৃপায় অসমীয়া লিপি তার জন্মের পাঁচশত বৎসর আগেই বরাক উপত্যকায় অবতীর্ণ বলে দেখা যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। সাধারণ অসমীয়া মানুষ কিন্তু দুই 'র' ঘটিত এই সমস্ত বিভ্রাট নিয়ে আদৌ বিব্রত নন। তাঁদের দৃষ্টিতে বাংলা এবং অসমীয়া লিপি এক এবং অভিন্ন। নিত্যদিনের কথাবার্তায় অনেক সময়েই তাঁরা নিজেদের লিপিকে 'বাংলা লিপি' বলেও অভিহিত করে থাকেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, একান্ত আধুনিক লেখক মহিম বরা (জন্ম ১৯২৬) 'তিনির তিন গল' নামক গল্পে এ যুগের একজন গ্রামীণ অসমীয়া মানুষের মুখে যে সংলাপ বসিয়েছেন, তা তুলে দিচ্ছি:

"ইংরেজী স্কুলের দুটামান শ্রেণী তাহানি পড়িছিল। অবশ্য এতিয়া ইংরেজী কিয়, বঙলা আখরো জোটাইহে পঢ়িব পারে" (পৃ. ১৭৪, অসমীয়া গল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত) বঙ্গানুবাদ: "ইংরেজী স্কুলে দুটি শ্রেণী সে পড়েছিল, এখন ইংরেজী কেন, বাংলা অক্ষরও বানান করে পড়তে হয়।"

সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তার বস্তুনিষ্ঠরূপ দিতে গিয়েই লেখক এই সংলাপের মধ্যে '**বঙলা আখর**' কথাটি বসিয়েছেন। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ দুটি লিপির মধ্যেকার মিলের কথাটাই জানেন, 'র' নিয়ে রণদামামা বাজানোটা উপর-তলার ব্যাপার।

ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি :

অসম সাহিত্যসভা প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে বরাক উপত্যকার ইতিহাস নিয়ে নানা ধরনের আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে। ইতিহাসের নামে অসত্য, অর্ধসত্য এবং বিকৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তের এমন ব্যাপক সমাহার এক জায়গায় সচরাচর চোখে পড়ে না। সবগুলো নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়, দু-একটি উল্লেখ করছি।

নিধনপুর লিপির কথা উল্লেখ করে নীতিশরঞ্জন নস্কর লিখেছেন যে ভাস্করবর্মা শ্রীহট্টের উত্তরাঞ্চলে কিছু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। আমরা আগে দেখিয়েছি যে ভাস্করবর্মার প্রদত্ত ঐ জমি যে শ্রীহট্টের কোনো অঞ্চলে ছিল তা কোনো অসমীয়া ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে ঐ জমি বিহারে অবস্থিত। উক্ত জমি শ্রীহট্টে ছিল বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা হচ্ছেন কিশোরীমোহন গুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী প্রভৃতি। তাঁরা সবাই কিন্তু উক্ত জমির স্থান নিরূপণ করেছেন দক্ষিণ শ্রীহট্টে, উত্তর শ্রীহট্টে নয়। নিধনপুর লিপিতে উল্লেখ রয়েছে যে উক্ত জমি চন্দ্রপুরি বিষয়ে (বিষয়= জেলা) অবস্থিত ছিল। তাম্রফলকটি পাওয়া গেছে পঞ্চখণ্ডের কাছে, এবং ঐ প্রাপ্তিস্থানের কাছেই চন্দ্রপুর বলে একটা গ্রাম রয়েছে। ঐ গ্রামটিই চন্দ্রপুরি বিষয়ের কেন্দ্র ছিল বলে তাঁরা মতপ্রকাশ করেছেন। কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরী পরবর্তী আরেকটি তাম্রফলকের সাহায্যে চন্দ্রপুরি বিষয়ের সীমা নির্ণয় করে তাঁর *Inscriptions of Sylhet* বইয়ে একটি মানচিত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যায় করিমগঞ্জ মহকুমা, মৌলবীবাজার মহকুমা ও হবিগঞ্জ মহকুমার অংশবিশেষ নিয়ে চন্দ্রপুরি বিষয় গঠিত ছিল। অর্থাৎ গোটা এলাকাটা দক্ষিণ শ্রীহট্টে, উত্তর শ্রীহট্টে নয়।

শিবানন্দ শর্মা 'কৃষক' নামে শ্রীহট্টের এক রাজার কথা উল্লেখ করেছেন, তারপর একেবারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিশাবে জানাচ্ছেন যে এই 'কৃষক' ছিলেন অসমীয়া চেটিয়া সম্প্রদায়ের লোক এবং ষষ্ঠশতকের কামরূপরাজ ভূতিবর্মার সামন্ত। এমনভাবে কথাগুলো লেখা হয়েছে যেন কোনো প্রত্নলিপিতে তিনি এই তথ্য পেয়েছেন। আবার আরো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য কছারী বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী ও ত্রিপুরা বুরঞ্জীর কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, 'কৃষক' নামক এই রাজা যে ভূতিবর্মার সামন্ত ছিলেন, তা তিনি কোন্ প্রত্নলিপি বা ঐতিহাসিক দলিলে পেলেন ? ভূতিবর্মার নামাঙ্কিত একটিমাত্র শিলালিপি এ পর্যন্ত

আবিষ্কৃত হয়েছে, যাকে বলা হয় বরগঙ্গা শিলালিপি, তাতে কৃষক বা অন্য কোনো সামন্তেরই উল্লেখ নেই। একই রাজবংশের ভাস্করবর্মার নিধনপুর ফলকে অনেক রাজপুরুষের নাম রয়েছে, কিন্তু 'কৃষক' বলে কেউ নেই। কছারী বুরঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরঞ্জী বা ত্রিপুরা বুরঞ্জীতে 'কৃষক' বা ভূতিবর্মা কারো কোনো উল্লেখই নেই। ফলে স্বীকৃত ঐতিহাসিক কোনো দলিল থেকে ঐ তথ্য তিনি সংগ্রহ করেননি। আসলে 'কৃষকে'র উল্লেখ রয়েছে 'হট্টনাথের পাঁচালী' বলে অর্বাচীন একটি পাঁচালীতে, যার রচনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। দুর্ভাগ্যতঃ রাজমোহন নাথ মনে করতেন ঐ পাঁচালীতে কিছুটা ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে, তাই তিনি 'কৃষক' সম্পর্কে তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রী শর্মা যদি 'হট্টনাথের পাঁচালী'র মূল পুঁথিটা পড়ে দেখতেন, তাহলে জানতেন যে ঐ পুঁথিতে ভূতিবর্মার নামগন্ধও নেই, চেতিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্কের কোনো উল্লেখ নেই এবং সত্যিকারের কোনো ইতিহাসও এতে নেই। 'হট্টনাথের পাঁচালী' সম্পূর্ণই একটি অলীক কল্পনা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রামীণ কবির কিংবদন্তী-নির্ভর কাব্যকে নির্ভর করে যাঁরা ষষ্ঠশতকের ইতিহাস তৈরি করতে চান, তাঁদের ইতিহাসচর্চা তো আরো অলীক হয়ে দাঁড়ায়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে শ্রীহট্ট-কাছাড়ের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে নিধনপুর লিপির কথা সবাই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু মহারাজা শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসন বা কেশবদেব-ঈশানদেবের ভাটেরা তাম্রশাসনের কথা আদৌ আসে নি। এই বিস্মৃতি কিন্তু অজ্ঞতাপ্রসূত নয়, সম্পূর্ণ সুপরিকল্পিত। শ্রীচন্দ্র পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিপতি ছিলেন, তাঁর রাজধানী ছিল ঢাকার বিক্রমপুরে (রামপাল)। দশম শতাব্দীর এই রাজার একটি তাম্রশাসন মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমভাগ গ্রামে পাওয়া গেছে। বস্তুতঃ এই অঞ্চলের ইতিহাসের উপাদান হিশাবে এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো নিদর্শন আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। 'শ্রীহট্ট' নামটি এই তাম্রশাসনেই সর্বপ্রথম উল্লিখিত হতে দেখি। তাম্রশাসনের মধ্যে রয়েছে যে তৎকালীন শ্রীহট্টমণ্ডল ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির (ভুক্তি = প্রদেশ) অন্তর্গত ("শ্রীপৌণ্ড্রবর্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি শ্রীহট্টমণ্ডল")। এই দলিলের দ্বারা মহারাজা শ্রীচন্দ্র ছয়হাজার ব্রাহ্মণকে শ্রীহট্ট অঞ্চলে বসিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে বৌদ্ধমঠ, হিন্দুমন্দির ইত্যাদির জন্যও জমিদান করেছিলেন। শ্রীচন্দ্রের এই তাম্রশাসনটির কথা স্মারকগ্রন্থের লেখকরা কেউ উল্লেখ করেননি, কারণ তাহলে বরাক উপত্যকার সঙ্গে বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক

ও রাজনৈতিক যোগাযোগের কথাটা প্রমাণ হয়ে যায়। যে পরিকল্পনা নিয়ে অসম সাহিত্যসভার স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদিত, শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত তথ্যাদি সে পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খায় না, অতএব এটার উল্লেখই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একই কারণে কেশবদেব-ঈশানদেবের ভাটেরা তাম্রশাসনের কথাও বাদ দেওয়া হয়েছে। এই দুই রাজা স্বতন্ত্র শ্রীহট্ট রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এবং তাম্রফলকের বিবরণ অনুসারে কাছাড়ের শালচাপড়া অঞ্চল এবং কালাইন ('কালিয়ানি') নদীর উত্তরাঞ্চল এই শ্রীহট্ট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তথ্যও স্মারক গ্রন্থের পণ্ডিতদের পছন্দ হয়নি। কারণ তাঁদের প্রতিপাদ্য হলো শ্রীহট্ট প্রাচীন যুগে কামরূপের অধীন ছিল। যে ঐতিহাসিক দলিলগুলি সরাসরি এই দাবি নাকচ করে দেয়, সেগুলো তাঁরা বিষবৎ পরিত্যাগ করেছেন। তার জায়গায় জনশ্রুতি এবং গুজবের উপর ভিত্তি করে ইতিহাস রচনার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

সত্যের অপলাপ আরো ঘটেছে। ডিমাসা কাছাড়ীদের রাজ্যের পোশাকী নাম ছিল 'হেরম্ব রাজ্য'। 'কাছাড়' নামটির ব্যাপক প্রয়োগ ব্রিটিশরাই শুরু করেন। শ্রীমতী নিরুপমা হাগজেরের মতে এই নাম পরিবর্তনের উদ্দেশ্য দিল ডিমাসাদের পূর্ব গৌরব হরণ করা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। শ্রীমতী হাগজের আরো বলছেন যে ব্রিটিশ আগমনের আগে কাছাড় নামটি আদৌ প্রচলিত ছিল না, এবং রাজসভার বাঙালী আমলারা ব্রিটিশকে দিয়ে ঐ নাম পরিবর্তন হাসিল করে। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে আমলারা ষড়যন্ত্র করেই এটা করিয়েছেন।

শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে বাঙালী কর্তৃক লিখিত ঐ আমলের যতগুলি পুঁথি দলিল পাওয়া গেছে, সেখানে সর্বত্রই 'হেরম্ব' নামটি ব্যবহার করা হয়েছে, অতএব বাঙালীরা 'হেরম্ব' নামটি পছন্দ করতেন না, একথাটি অসত্য। এমন-কি ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার বহু পরে কাছাড়ী রাজসভার আইন গ্রন্থটি যখন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তখনও তার নামকরণ করা হয় 'হৈরম্ব রাজ্যের দণ্ড বিধি'। কিন্তু ব্রিটিশ আগমনের আগে এই রাজ্য আদৌ 'কাছাড়' নামে পরিচিত ছিল না, তাও সত্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আহোম রাজসভায় রচিত অসমীয়া বিবরণ গ্রন্থ 'তুংখুঙ্গিয়া বুরঞ্জী'র কথা উল্লেখ করা যায়। আহোম রাজ দরবারের কর্মচারী শ্রীনাথ দত্ত বরুয়া আসাম বা কাছাড় ব্রিটিশ দখলে যাওয়ার আগেই (১৮০৬ খ্রীঃ) গ্রন্থটি সংকলন করেন। এই 'তুংখুঙ্গিয়া বুরঞ্জী'তে বারবারই রাজ্য হিশাবে 'কাছাড়' নামটির উল্লেখ দেখা যায় (অনুচ্ছেদ ৬০, ৬৯, ৭৯, ৯৩, ৯৫, ৯৮, ১৪২,

২৭৯, ৩৪০, ৩৫৭, ৩৬৭ ইত্যাদি)। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত 'ত্রিপুরা বুরঞ্জী'তে আহোম রাজদূত বারবার রাজ্যটির নাম 'কছারী' বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত বিস্তৃত অসমীয়া বুরঞ্জী সাহিত্যে কদাচিৎ কাছাড়ের রাজাকে 'হৈড়ম্বেশ্বর' বলে অভিহিত করা হয়েছে, বরাবরই লেখা হয়েছে 'কছারী রজা'। বাঙালীদের বহুতর দোষ রয়েছে, তবে এক্ষেত্রে হেড়ম্ব রাজ্যকে 'কাছাড়' নাম দেওয়ার দায়িত্ব বোধহয় তাঁদের ঘাড়ে বর্তায় না, যাঁদের ঘাড়ে বর্তায়, তাঁদের নাম বোধহয় শ্রীমতী হাগজের নিতান্ত সংকোচবশতঃই উল্লেখ করতে পারেননি।

শ্রীমতী হাগজের লিখেছেন: "তাম্রধ্বজ মহারাজার মহিষী রানী চন্দ্রপ্রভা আহোম রাজকন্যা ছিলেন, তাই কাছাড়ের সঙ্গে আহোম রাজার আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল। ফলে আসা-যাওয়া আত্মীয় সম্বন্ধও চলছিল" (স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৩৫, অসমীয়া থেকে অনূদিত)।

আহোম-কাছাড়ী সম্পর্ক নিয়ে সবচাইতে বিস্তৃত ও তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন ডঃ লক্ষ্মী দেবী তাঁর *Ahom-Tribal Relations* বইতে। তিনি জানাচ্ছেন যে আহোমদের সঙ্গে কাছাড়ীদের বৈবাহিক সম্পর্ক দু-একবার স্থাপিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো বারই তার ফলাফল শুভ হয়নি। বরঞ্চ কাছাড়ী রাজা ভীমবল নারায়ণ আহোম রাজকন্যার যথারীতি সমাদর করেননি, তাই আহোম রাজা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে বেশ মনোমালিন্য হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংঘর্ষে দাঁড়ায়। যে যাই হোক, আলোচ্য ক্ষেত্রে তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে রাজা তাম্রধ্বজের পত্নী চন্দ্রপ্রভা কি সত্যি আহোম রাজকন্যা ছিলেন? দেওধাই বুরঞ্জী ও জয়ন্তীয়া বুরঞ্জীতে চন্দ্রপ্রভার কথা রয়েছে, কিন্তু তাঁকে কিন্তু আহোম রাজকুমারী হিশাবে উল্লেখ করা হয়নি। বরঞ্চ 'দেওধাই বুরঞ্জী'তে 'চন্দ্রপ্রভা'কে বলা হয়েছে 'কছারী কুঁয়রী', কোনো আহোম রাজকন্যাকে আহোম ঐতিহাসিকরা 'কছারী কুঁয়রী' বলবেন, এটা বেশ অস্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ আহোম রাজার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠানোর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রানী বলছেন: "ঐ অসমের ভয়ে আমরা খাসপুর পালিয়ে এলাম।" দেওধাই বুরঞ্জীতে উল্লিখিত ঐ সংলাপটিও আহোম রাজকন্যার মুখে ঠিক মানানসই বলে মনে হচ্ছে না।

যাই হোক, শ্রীমতী হাগজের বলতে চাইছেন যে তাম্রধ্বজের পত্নী আহোম রাজকন্যা হওয়ার দরুনই 'আত্মীয়তা কুটুম্বিতা আসা যাওয়া' অর্থাৎ রাজনৈতিক ও

সামাজিক লেনদেন বেড়ে যায়। ইতিহাস কিন্তু অন্যকথা বলছে। ডঃ লক্ষ্মী দেবী জানাচ্ছেন যে রাজা তাম্রধ্বজের মৃত্যুর পর দীর্ঘ ষাট বছর আহোমদের সঙ্গে কছারীদের কোনো যোগাযোগই ছিল না, অন্ততঃ বুরঞ্জী বা অন্যকোনো ঐতিহাসিক দলিলে দুই তরফের মধ্যে যোগাযোগের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। (*Ahom-Tribal Relations*, p. 99)। তারপর আবার যখন সে উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সংঘাতের বিবরণ পাওয়া যায়, কুটুম্বিতার নয়। 'আত্মীয় সম্বন্ধ' বেড়ে যাওয়ার আশ্চর্য নিদর্শনই বটে।

অতঃপর শ্রীমতী হাগজের লিখেছেন: "অবশ্য মাজে সময়ে হাইকাজিয়া, যুঁজ, আক্রমণ আদিও ঘটিছে, তাক মই অস্বীকার ন করো", শ্রীমতী হাগজের অবশ্য অস্বীকার করলেও পারতেন, কারণ ইতিপূর্বে বহু সত্যকেই তিনি বেমালুম অস্বীকার করেছেন। আসলে আহোম-কাছাড়ী সম্পর্কের ব্যাপারটাকে খুব সাধারণভাবে সাময়িক মনোমালিন্যের ব্যাপার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গোটা ঐতিহাসিক পর্ব জুড়েই এই সংঘাত ধারাবাহিকভাবে চলে, যার ফলে আহোমদের আক্রমণে কাছাড়ীরা প্রথমে ডিমাপুর ছাড়েন, তারপর ছাড়তে হয় মাইবং এবং খাসপুরে আশ্রয় নেওয়ার পরও একেবারে নিশ্চিত থাকা সম্ভবপর হয়নি। ডঃ লক্ষ্মীদেবী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে আহোমদের যে সম্প্রসারণ-পরিকল্পনা ছিল, তাতে কাছাড়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা আদৌ তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অন্যদিকে কাছাড়ীরাও নিজেদের দুর্ভাগ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আহোমদের সম্পর্কে কোনোদিনই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতে পারেননি। ডঃ লক্ষ্মীদেবীর ভাষায়: "Though the circumstances compelled the Kacharis to recognise the hegemony of the Ahoms and abandon their plain territories to them, they did not give up their hostile attitude towards the Ahoms till the end of the Ahom rule in Assam" (*Ahom-Tribal Relations*, p. 104)। এই ধারাবাহিক এবং দীর্ঘস্থায়ী শত্রুতা-মূলক সম্পর্কের মধ্যে উভয় রাজবংশ যে সাংস্কৃতিক লেনদেনে খুব একটা আগ্রহী বোধ করতেন, এমন আশা করা দুরূহ। অথচ শ্রীমতী হাগজের এমনই একটা চিত্র তুলে ধরতে চেয়েছেন, যা ঐতিহাসিক বিচারে আদৌ ধোপে টেঁকে না।

বিভিন্ন ধরনের বিভাজন সৃষ্টির প্রয়াস

বরাক উপত্যকায় অসম সাহিত্যসভার অধিবেশনের আয়োজকরা এই ঘোষণায় সতত সোচ্চার ছিলেন যে সংহতি ও মিলনের সেতুবন্ধ গড়ে তোলার জন্যই তাঁদের এই উদ্যোগ। কিন্তু সাহিত্যসভার অধিবেশনের কার্যবিবরণী, প্রদত্ত বক্তৃতা এবং স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত রচনাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বরাক উপত্যকার অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সংশয় এবং বিভেদসৃষ্টির একটা সযত্নরচিত পরিকল্পনা প্রথম থেকেই এই উদ্যোগের মধ্যে নিহিত ছিল।

প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে হাইলাকান্দি মহকুমাকে বরাক উপত্যকার অন্যান্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার একটা প্রয়াস উৎকটভাবে করা হয়েছে। হাইলাকান্দি মহকুমা নাকি বরাবরই অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে এবং এই মনগড়া প্রতিপাদ্যের পরি-প্রেক্ষিতে হাইলাকান্দি-সম্পর্কে বক্তা ও লেখকরা একেবারে উচ্ছ্বাসের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। দুঃখের বিষয়, অসম সাহিত্যসভার যারা নিয়ামক, তাঁদের এই হাইলাকান্দি প্রীতি কিন্তু একান্তই হাল আমলের ব্যাপার; পুরানো ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে হাইলাকান্দি সম্পর্কে এঁরা আগে কিন্তু প্রবল বীতরাগই পোষণ করতেন। দেশবিভাগের সময়ে কাছাড় জেলা, বিশেষ করে হাইলাকান্দি মহকুমাকে আসাম তথা ভারত থেকে বের করে দেওয়ার জন্য এঁরা বেশ জোরালো উদ্যোগ নিয়েছিলেন। অসম সাহিত্যসভার একান্ত সমর্থক 'আসাম ট্রিবিউন' পত্রিকা দেশবিভাগের ঠিক আগে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুলাই লিখেছিলেন, "There seems to be no justification in retaining a few thanas of Sylhet district and *Hailakandi subdivision* of Cachar district within the province of Assam." (বঙ্গানুবাদ: "সিলেটের কয়েকটি থানা এবং কাছাড় জেলার **হাইলাকান্দি** মহকুমাকে আসাম প্রদেশের মধ্যে রাখার কোনো যৌক্তি-কতা নেই")। পত্রিকাটি এই মন্তব্য করেছিলেন অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর একটি বিবৃতির সূত্র ধরে, তার আগের দিন, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই অম্বিকা-গিরি রায়চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: "There is little cause in trying to retain the junior partner of Sylhet—the Cachar plains,

at any rate, Hailakandi subdivision, in Assam" (*Assam Tribune*, July 22, 1947 ; বঙ্গানুবাদ : "কাছাড়ের সমতল অঞ্চল হচ্ছে সিলেটের ছোটো শরিক—তাকে, বিশেষ করে তার হাইলাকান্দি মহকুমাকে আসামে ধরে রাখার সামান্যতম কারণও নেই")। উল্লেখ করা প্রয়োজন, রায়চৌধুরী মহাশয় অসম সাহিত্যসভার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন এবং এর তিন বছর পর, অর্থাৎ ১৯৫০ সালে তিনি অসম সাহিত্যসভার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

দেখা যাচ্ছে কাছাড় জেলার মধ্যেও বিশেষভাবে হাইলাকান্দি মহকুমা এঁদের কাছে চক্ষুশূল বিবেচিত হয়েছিল। তাঁরাই যে আজ হাইলাকান্দি-প্রেমে গদগদ হয়ে উঠছেন, তাতে বোঝা যায় ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক গতিপথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে না।

অঞ্চলভিত্তিক বিভাজন ছাড়াও জাতি, ধর্ম, ভাষা ও বর্ণভিত্তিক বিভেদসৃষ্টির প্রবণতাও বহুস্থলেই প্রকাশ্যরূপ নিয়েছে। সর্বশেষ সেন্সাস (১৯৭১ সালের ; আসামে ১৯৮১ সালের সেন্সাস হয়নি) অনুসারে বরাক উপত্যকার জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশিভাগ বঙ্গভাষী। এঁরা ঐক্যবদ্ধ থাকায় অসমীয়াকরণের প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। তাই এঁদের মধ্যে তিন ধরনের বিভাজন করার চেষ্টা হয়েছে, প্রথমতঃ স্থানীয় এবং অস্থানীয় ; দ্বিতীয়তঃ হিন্দু এবং মুসলমান ; তৃতীয়তঃ বর্ণহিন্দু ও অনুসূচিত জাতি। এছাড়া বরাক উপত্যকায় বিভিন্ন ভাষিক সংখ্যালঘু যে সমস্ত গোষ্ঠী রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে বঙ্গভাষীদের সম্পর্কে চিড় ধরানোর উদ্যোগ বেশ ব্যাপকভাবেই নেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো সময়ে এই ব্যাপারে ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গির শালীনতা পর্যন্ত বজায় থাকেনি।

আমরা অবশ্য জানি যে পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং বিভেদসৃষ্টির এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই। আসাম আন্দোলনের দুর্যোগময় দিনগুলিতেও বরাক উপত্যকার মানুষ ঐ আন্দোলনের সংকীর্ণতাবাদী রূপটিকে যথাযথভাবে ধরতে পেরেছিলেন, তাই বরাক উপত্যকা তার আওতা থেকে মুক্ত ছিল। এখনকার প্রয়াস অবশ্য আরো ব্যাপক এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের আনুকূল্যে পরিপুষ্ট, তবুও এ আস্থা আমাদের রয়েছে যে আক্রমণ যত তীব্র হবে, বরাক উপত্যকার মানুষের প্রতিরোধও হবে ততখানি দুর্বার।

উপসংহার

যে-সমস্ত বিষয় ও প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হলো, এই ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়া, বিশেষতঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্চ থেকে, শুধু ক্লান্তিকর নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকরও বটে। এক ধরনের সংকীর্ণতাবোধ অনিবার্যভাবেই এই ধরনের বিতর্কে অন্তর্লীন থাকে, যা সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার মৌলিক লক্ষ্যের পরিপন্থী। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় কোনো সম্প্রসারণবাদী গোষ্ঠী যদি একটি অঞ্চলের সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ লোপাট করে দিয়ে সেই আগ্রাসনকেই সংহতির পরাকাষ্ঠা বলে জাহির করতে চায়, তবে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই কতকগুলি সত্যকথন অনিবার্য হয়ে পড়ে। বাধ্যতামূলকভাবে আরোপিত এই অপ্রিয় দায়িত্বটুকুই আমরা পালন করছি মাত্র।

আমরা সচেতন যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অসমীয়া ও জনজাতীয় সংস্কৃতি কর্মীদের বড়ো একটি অংশ এই ধরনের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণবাদের বিরোধী এবং ভ্রাতৃত্ব-বোধ, সমন্বয় এবং সহাবস্থানের ভিত্তিতে সমগ্র রাজ্যে একটি উদার ও উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টি করার সংগ্রামে তাঁরা নিয়োজিত। তাঁদের সেই মহৎ প্রয়াসের প্রতি আমাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার হাত সদাই প্রসারিত, সর্বশেষে এই কথাটি আমরা নিবেদন করতে চাই।

—

নির্দেশপঞ্জি ও টীকা

১। বরাক উপত্যকার স্থানীয় বাংলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পেশ করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ইতিহাসবিদ দেবব্রত দত্ত। ভাষাচার্য চট্টোপাধ্যায়ের জবাবের প্রাসঙ্গিক অংশ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'হৈড়িম্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ভাষাচার্য চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

"আপনি যে সমস্যা আমার কাছে তুলে ধরেছেন, আসলে তা কোনো সমস্যাই নয়, কারণ যে সমস্ত শব্দ আপনি উদ্ধৃত করেছেন, তা সমভাবেই বাংলা এবং অসমীয়াতে বিদ্যমান রয়েছে। আর এই সব শব্দ বিশেষভাবে অসমীয়া শব্দ নয়, সেসব শব্দ আদি ও মধ্য বাঙ্গলায় দেখা যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন সমস্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় যা অসমীয়া বা পূর্ব বাংলার কথ্য ভাষা (dialect) ধারণ করে আছে। তার মধ্যে একটি হল 'স' এর পরিবর্তিত রূপ 'হ'।

আমাকে এই চিঠি মুখে বলে লেখাতে হচ্ছে, নইলে আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম যে এই সমস্ত শব্দের আদি প্রতিরূপ রয়েছে যা কিনা পশ্চিমবঙ্গেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই কথাটি আমরা এবং আমাদের অসমীয়া বন্ধুরা প্রায়শই ভুলে যাই। অসমীয়াতে 'নদী' বোঝাতে 'নৈ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'নদী' থেকে,—'নৈ' ওড়িয়াতেও প্রচলিত। বাংলাতে 'নৈ' শব্দ অপ্রচলিত, তবে আমাদের তো 'নৈহাটি' রয়েছে, যা কিনা নদীতীরবর্তী বাজার বোঝায়। তাই বলতে পারি এটা শিলচর বা কাছাড় ডায়লেক্টের কোনো সমস্যা নয়—তারা এই সব শব্দ পেয়েছেন পূর্ব বাংলার সূত্রে,—সিলেট ও ময়মনসিং-এ যা চলতি এবং যেখান থেকে তা কাছাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।"

২। উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে ডঃ অমলেন্দু গুহ রচিত *'From Planters' Raj to Swaraj* গ্রন্থ থেকে।

৩। ত্রিপুরার রাজার কাছে লেখা আহোমরাজ রুদ্রসিংহের একটি চিঠিতে রয়েছে : "...পরং সমাচার জনঘোষ এমন প্রসিদ্ধ হৈয়াছে যে মোগলের বৈপরীত্য চেষ্টাতে বেদোক্ত ধর্ম রক্ষা পাই না।"—এখানে অসমীয়া ভাষার রীতি ভেঙে নেতি-বাচক 'না' ক্রিয়াপদের পরে বসেছে। প্রাচীন লেখায় এ ধরনের ব্যতিক্রম থাকতেই পারে, শুধুমাত্র এই প্রয়োগের জন্যই কেউ একথা বলবেন না যে মহারাজ রুদ্রসিংহ বাংলায় চিঠি দিয়েছিলেন। উদ্ধৃতটি নেওয়া হয়েছে ডঃ সূর্যকুমার ভূঞা সম্পাদিত 'ত্রিপুরা বুরঞ্জী', পৃ. ১৬ থেকে।